জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, সুনামগঞ্জ

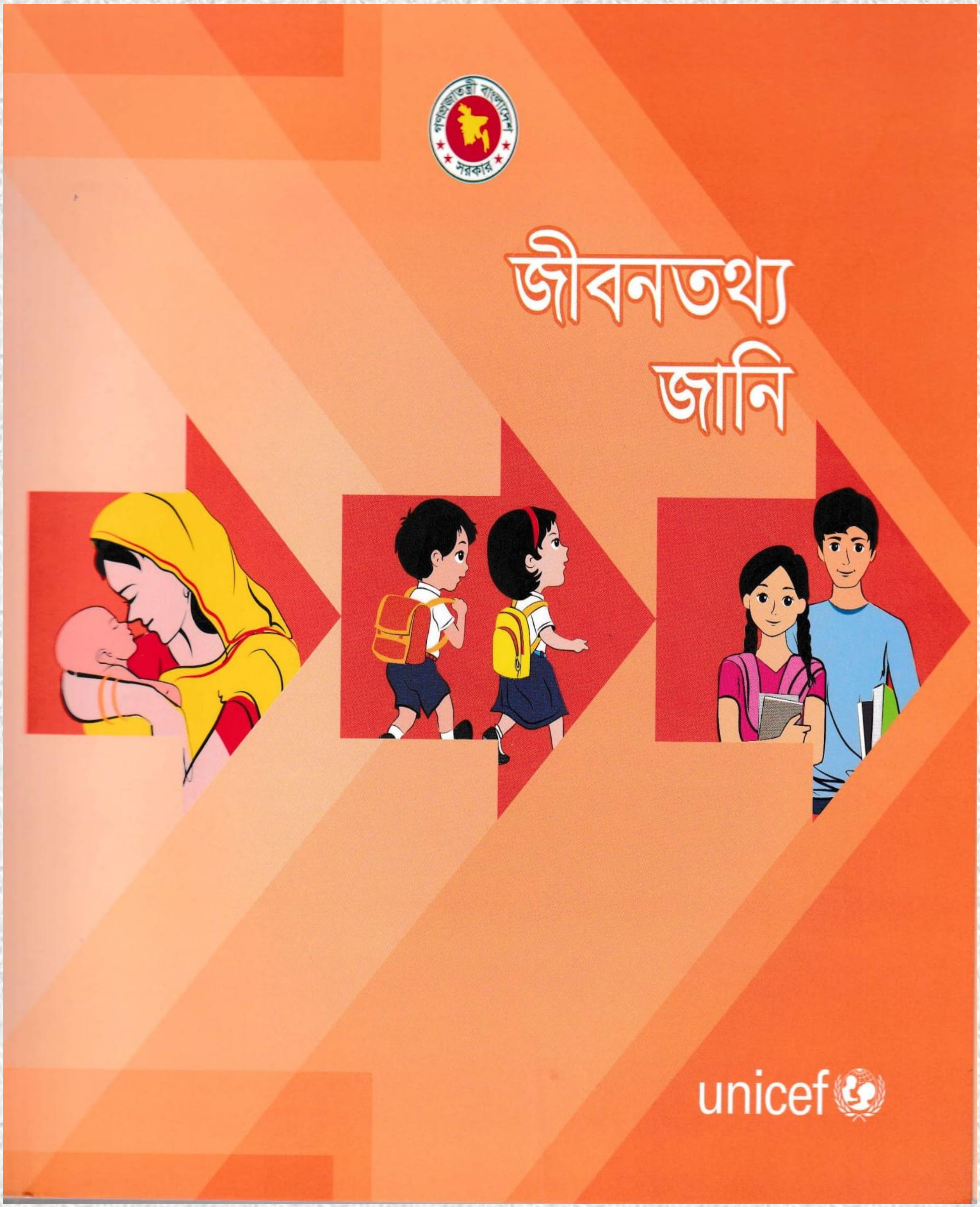

ভূমিকা

বাংলাদেশে শহরে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুরা অনেকটাই অবহেলিত। চাইল্ড ওয়েলবিয়িং সার্ভে–২০১৬ (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, শহরের অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী শিশুরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং সুরক্ষা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বঞ্চিত।

এসব অনগ্রসর এলাকার অনেক শিশুই বাল্যবিবাহ এবং শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক শিশুই স্কুলে যায় না বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। বেশির ভাগ শিশুই জন্ম নিচ্ছে ঘরে দাই-এর হাতে। জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুদের জন্ম নিবন্ধন হার খুবই নগণ্য। নবজাতকের সঠিক যত্ন, নির্দিষ্ট বিশেষ সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, কিশোরীদের মাসিককালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস- এসব বিষয়ে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। ফলে রাষ্ট্র শিশুদের জন্য যে অধিকার দেয়ার কথা বলেছে, তা তারা পুরোপুরি ভোগ করতে পারছে না।

শিশুদের এই অবস্থার মূল কারণ হলো, অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের জন্য অপর্যাপ্ত সেবা সুবিধা এবং সেই সাথে শিশুদের অধিকার, সঠিক পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের মা-বাবা, পরিচর্যাকারী ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষা বিষয়ে মা-বাবা, পরিবারের সদস্য ও এলাকার মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

এই বইটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুদের অধিকার ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যা বিষয়ে পরিবার ও সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এ বইটিতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, শিশুর নিরাপদ জন্ম, নবজাতকের যত্ন, পুষ্টি, শিক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি, বাল্য বিয়ে ও শিশুশ্রম বন্ধ, জন্ম নিবন্ধন, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং শিশুর লালন-পালন বিষয়ে তথ্য রয়েছে। এই তথ্যগুলো অভিভাবকরা জানলে এবং তা মেনে চললে প্রতিটি শিশুর, তাদের মায়েদের ও কিশোর-কিশোরীদের জীবন বদলে যাবে এবং তারা একটি সুস্থ এবং উন্নত জীবন পাবে।

শিশু সুরক্ষা কমিটি'র সদস্য, 'মা' দলের সদস্য, মসজিদের ইমাম এবং শিশু অধিকার কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মী এই বই-এর তথ্যসমূহ জেনে নিজেরা সমৃদ্ধ হতে পারবেন এবং তাদের নিজ-নিজ এলাকার মা-বাবা, অভিভাবকদের তথ্য দিয়ে সচেতন করতে পারবেন। এর ফলে শিশুরা সুস্থ ও নিরাপদভাবে বেড়ে উঠতে পারবে এবং শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হবে।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা ০১ স্বাস্থ্য

পৃষ্ঠা ২০ পুষ্টি

পৃষ্ঠা ৩০ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি

পৃষ্ঠা ৩৫ শিক্ষা

পৃষ্ঠা ৩৮ শিশু সুরক্ষা

স্বাস্থ্য

গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর স্বাস্থ্য পরিচর্যা

গর্ভধারণ নারী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। 'গর্ভধারণের শুরু থেকে প্রসব পরবর্তী ৪২ দিন' এই সময়ে মায়ের প্রয়োজন বিশেষ যত্ন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

- গর্ভকালীন, প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে মায়ের প্রতি সামান্য অবহেলা তার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে। এমনকি গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে সঠিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাবে একজন 'মা' মারাও যেতে পারে
- গর্ভকালীন সময়ে মায়ের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। নির্যাতিত মায়ের গর্ভস্থ শিশু বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকে
- বাংলাদেশে প্রতি বছর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে অনেক মা স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাবে মারা যায়।

এসব অকাল মৃত্যু এড়ানো যায়, যদি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয় মেনে চলা যায় :

১. গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

২. স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করানো

৩. প্রসব করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ

১ গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময়

প্রথম স্বাস্থ্য পরীক্ষা
গর্ভধারণ করার সাথে সাথেই

দ্বিতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা
গর্ভধারণের ৪-৬ মাস সময়ে

৪ বার

তৃতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা
গর্ভধারণের ৮ মাস সময়ে

চতুর্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা
গর্ভধারণের ৯ মাস সময়ে

১. এই ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় মায়ের অবশ্যই হিমোগ্লোবিন, রক্তচাপ ও প্রস্রাবে এলবুমিন পরীক্ষা করতে হবে
২. ডাক্তারের পরামর্শে প্রয়োজনে আরও বেশি বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হতে পারে

- **গর্ভকালীন সময়ে ৪ বার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন কেন?**
- গর্ভবতী মা ও গর্ভের সন্তানের শারীরিক অবস্থা জানা যায়
- গর্ভবতী মা ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা সমস্যা চিহ্নিত করা যায় এবং সেই অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা নেয়া যায়, যা মা ও গর্ভের শিশুকে সুস্থ রাখে।

২ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করানো

প্রসবকাল মা ও শিশু উভয়ের জন্যই সংকটময় সময়। তাই প্রতিটি প্রসব হওয়া উচিত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে ডাক্তার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা আছে। ফলে প্রতিটি জন্ম হবে নিরাপদ।

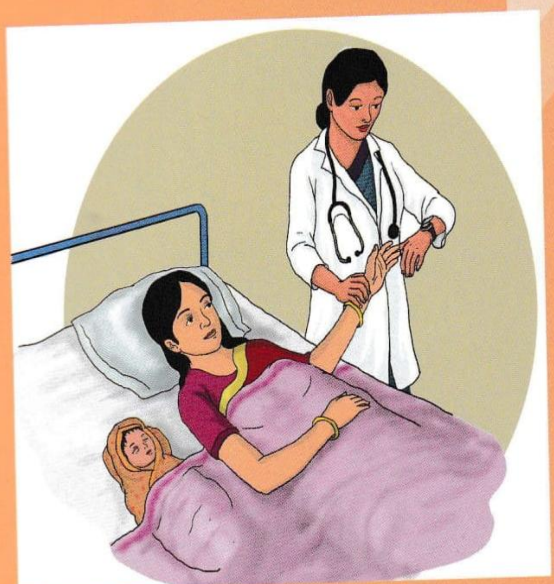

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করানো প্রয়োজন কেন?

- মা ও শিশুর জীবনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রতিটি প্রসব হওয়া উচিত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে
- মা ও গর্ভের সন্তানের যেকোনো স্বাস্থ্য সমস্যা হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকায় সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া যায়। ফলে মা ও শিশুর জীবন রক্ষা পায় এবং মা ও শিশু সুস্থ থাকে
- দাই-এর সাহায্যে বাড়িতে প্রসব করানোর ফলে আমাদের দেশের অনেক মা ও শিশু মারা যায়। কারণ, বাড়িতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় জন্মের সময় মা ও শিশু উভয়ের কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মা ও শিশু উভয়েই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

৩ প্রসবের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো

প্রসবের পরও মা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। প্রসবের পর ৪২ দিনের মধ্যে মাকে কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যেতে হবে।

প্রসবের পর ৪২ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪ বার মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময়সূচী

১ম বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা
প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে

২য় বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা
প্রসবের ৩-৪ দিনের মধ্যে

৩য় বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা
প্রসবের ৭-১৪ দিনের মধ্যে

৪র্থ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা
প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে

সন্তান জন্মদানের পরও মাকে কেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যাওয়া প্রয়োজন

- সন্তান জন্মের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনেক মায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যু হয় এবং এটি মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ। তাই সন্তান জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি রোধ করা যাবে
- মায়ের মৃত্যুকে রোধ করা গেলে একটি শিশুকে মাতৃহীন হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। মায়ের মৃত্যু হলে শিশুটি মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে শিশু অপুষ্ট হয় এবং মাতৃহারা শিশু অবহেলায় বড় হয়।

শিশু জন্মের পর মায়ের স্বাস্থ্যসেবা মাকে সুস্থ রাখবে এবং শিশুও স্বাস্থ্যবান হিসেবে বেড়ে উঠবে।

৪ গর্ভবতী মায়ের ৫টি বিপদ সংকেত

মায়ের যেকোনো একটি বিপদচিহ্ন দেখা দিলে মাকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে, অন্যথায় মায়ের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা

নবজাতকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা

জন্মের পর ২৮ দিন শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। নবজাতকের সঠিক যত্নের অভাবে এ সময় অনেক শিশু মারা যায়। তাই এই সময় নবজাতকের সঠিক পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

নবজাতককে উষ্ণ রাখা জন্মের পর শিশুকে নরম, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত ও শুকনো কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। তারপর নবজাতক শিশুকে আর একটি নরম, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত ও শুকনো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে মায়ের বুকের সাথে শরীরের স্পর্শে রাখতে হবে। ফলে মায়ের শরীরের তাপে শিশুর শরীরের তাপমাত্রা সঠিক রাখবে।

শিশু যে কক্ষে জন্ম নেবে সেই কক্ষটি যেন ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে না হয়। কক্ষটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত সূর্যের আলো থাকতে হবে।

জন্মের সাথে সাথে গোসল না করানো জন্মের ৩ দিন পর গোসল করাতে হবে। জন্মের পরপর শিশুকে গোসল করালে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে, যার কারণে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

নাভির যত্ন পানিতে ১ ঘণ্টা সময় নিয়ে ফোটানো জীবাণুমুক্ত নতুন ব্লেড দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স বা দাই দিয়ে নাভি কাটাতে হবে। নাভি কাটার সাথে সাথে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন দ্রবণ লাগাতে হবে।

নবজাতককে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে

গর্ভফুল পড়ার অপেক্ষা না করে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। মায়ের বুকের প্রথম দুধ বা 'শাল দুধ' খাওয়াতে হবে। এই দুধে রয়েছে শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। 'শাল দুধ' ফেলা যাবে না।

✓মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুর মুখে মধু, চিনির পানি বা পানি কিছুই দেয়া যাবে না।

✓এসব অত্যাবশ্যকীয় সেবা নবজাতকের অকালমৃত্যু ও অসুস্থতা রোধ করবে।

নবজাতকের ৬টি বিপদচিহ্ন

১. নবজাতকের যেকোনো একটি বিপদচিহ্ন দেখা দিলেই তাকে দ্রুত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে। নবজাতককে উষ্ণ রাখতে হবে এবং মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।

২. কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া (২.৫ কেজি-'র কম ওজন) এবং স্বাভাবিক সময়ের আগে জন্ম নেয়া (৩৭ সপ্তাহের পূর্বে) শিশুদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাদের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

- ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে টিকা দিয়ে শিশুদের যে সকল সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ করা যায়, সেগুলো হলো :

১ শিশুদের যক্ষা	২ পোলিও	৩ ডিপথেরিয়া
৪ হুপিং কাশি	৫ ধনুষ্টংকার	৬ হেপাটাইটিস-বি
৭ হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগ	৮ হাম	
৯ নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া	১০ রুবেলা	

সব ক'টি রোগই সংক্রামক এবং টিকাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। মেয়ে-ছেলে নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুকে সবগুলো টিকা সময়মতো দেয়া প্রয়োজন। তাই জন্মের **১৫** মাসের মধ্যে শিশুকে সবগুলো টিকা দেয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১ জন্মের প্রথম বছরে সবগুলো টিকা নেয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে সবগুলো টিকা দিতে কমপক্ষে ৫ বার টিকাদান কেন্দ্রে আনতে হবে।

২ টিকা দেয়ার ফলে ১০টি প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। টিকা না দিলে শিশুর অসুস্থ হওয়া, চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা বেড়ে যায়।

৩ অসুস্থ শিশুকে সাময়িকভাবে টিকা দেওয়া যাবে না। তবে শিশু সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে টিকা দিতে হবে।

৪ টিকা দিলে সামান্য জ্বর ও ব্যথা হতে পারে এবং বিসিজি টিকার স্থানে ঘা হবে, এতে ভয়ের কিছু নেই।

- সময়সূচি অনুযায়ী সবগুলো টিকা নিলে শিশু মারাত্মক সংক্রামক রোগসমূহ হতে রক্ষা পাবে
- সময়সূচি অনুযায়ী টিকা না নিলে শিশুর মারাত্মক সংক্রামক রোগসমূহের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হবে না। এতে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

টিকার ডোজ এবং সময়সূচি

- বিসিজি টিকার নির্দিষ্ট ডোজটি জন্মের পরপরই নেয়া যায়। টিকা নেয়ার পর বিসিজি টিকার স্থানে (বাম বাহুতে) স্বাভাবিকভাবে ঘা হবে এতে ভয়ের কিছু নেই
- শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ/৪২ দিন হলেই পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব), বিওপিভি এবং পিসিভি টিকার ১ম ডোজ দিতে হবে। তারপর কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ/২৮ দিন পূর্ণ হলে এসব টিকার ২য় এবং ৩য় ডোজ দিতে হবে
- শিশুকে আইপিভি টিকার দুই ডোজ টিকা: ১ম ডোজ ৬ সপ্তাহ/৪২ দিন হলে, ২য় ডোজ ১৪ সপ্তাহ বয়সে দিতে হবে
- ১০ মাসে পড়লেই/২৭০ দিন পূর্ণ হলেই শিশুকে হাম ও রুবেলার ১ম ডোজ এবং ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলেই ২য় ডোজ টিকা দিতে হবে।

ডায়রিয়া

জীবাণু, বিশেষ করে মলমূত্রের জীবাণু মুখ দিয়ে পেটে গেলে ডায়রিয়া হয়। মল স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সরিয়ে ফেলা না হলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে, নিরাপদ পানি পান না করলে এবং শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো না হলে ডায়রিয়ার সংক্রমণ বেশি হয় (যেসব শিশু জন্মের প্রথম ছয় মাস শুধু মায়ের দুধ খায় এবং যাদের সবগুলো টিকা সময়মতো দেয়া হয় তাদের ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে)।

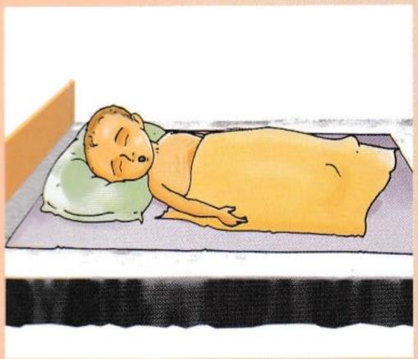

ডায়রিয়ায় শিশুর শরীরে কী প্রভাব ফেলে

- ডায়রিয়া হলে শিশুর শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় এবং শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। আর এ কারণে ডায়রিয়ায় শিশুর মৃত্যু হয়
- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে কিংবা পায়খানার সাথে রক্ত গেলে কিংবা পায়খানার সাথে বমি হলে শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুকে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে।

ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর পরিচর্যা

- ডায়রিয়া শুরু হলেই মায়ের দুধসহ স্বাভাবিক খাবার ও তরল খাবার খাওয়ানোর পাশাপাশি শিশুকে খাবার স্যালাইন দিতে হবে
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে নিয়মিত খেতে দেয়া প্রয়োজন। ডায়রিয়া থেকে সেরে ওঠার সময় শিশুকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করে খেতে দিতে হবে, যাতে তার অসুস্থতার কারণে হারানো শক্তি ও পুষ্টি দ্রুত পূরণ হয়
- ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে ১০ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত খাবার স্যালাইন ও জিংকযুক্ত খাবার ও পানি দেয়া উচিত। এ সময় ডায়রিয়ার জন্য কোনো ওষুধ প্রয়োজন নেই।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ

- ডায়রিয়া প্রতিরোধ করতে সব ধরনের মল এমনকি নবজাতক ও ছোট্ট শিশুর মলও ল্যাট্রিন বা টয়লেটে ফেলতে হবে কিংবা তা মাটিচাপা দিতে হবে
- ঠিকমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে এবং নিরাপদ পানি পান করলে ডায়রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া হলো ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টিকারী একটি রোগ। প্রথম থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা ও যত্ন না নিলে নিউমোনিয়া মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এর ফলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

নিউমোনিয়া হলো ফুসফুসপ্রদাহ সৃষ্টিকারী একটি রোগ

সুস্থ শিশু

সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত শিশু

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশু

শিশুর নিউমোনিয়া বা খুব মারাত্মক রোগের লক্ষণ

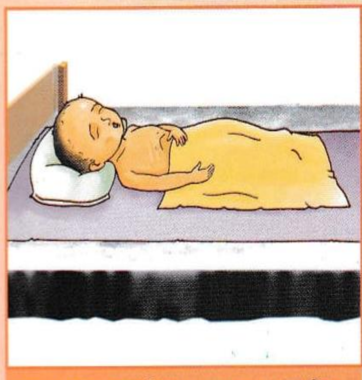
শান্ত অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত শ্বাস নিলে

শ্বাস নেবার সময় বুকের নিচের অংশ দেবে গেলে

রোগের লক্ষণ দেখা দিলে করণীয়

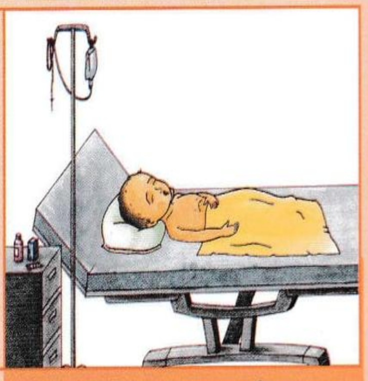
দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে

নিউমোনিয়ার লক্ষণ

- শ্বাসকষ্ট
- ঘনঘন শ্বাস বা দ্রুত শ্বাস- স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত শ্বাস নেয়া
- বয়স অনুপাতে দ্রুত শ্বাস (ঘনঘন শ্বাস) তখনই বলা হবে, যখন-
  - ১ দিন থেকে ২ মাস বয়সি শিশুর শ্বাস প্রতি মিনিটে ৬০ বা তার বেশি
  - ২ মাস থেকে ১২ মাস বয়সি শিশুর শ্বাস প্রতি মিনিটে ৫০ বা তার বেশি
  - ১২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সি শিশুর শ্বাস প্রতি মিনিটে ৪০ বা তার বেশি বার হয়
- বুকের নিচের অংশ ভিতরের দিকে দেবে যায়- সাধারণভাবে শ্বাস নেয়ার সময় বুকের খাঁচা ফুলে ওঠে।

এসব লক্ষণ দেখা দিলে শিশুকে সাথে সাথেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে।

শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধের উপায়

- বাড়ির ভেতরে শিশুকে ধুলাবালি, রান্নাঘরের ধোঁয়া ও ধূমপানের ধোঁয়া থেকে নিরাপদে রাখা
- শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো ও সময়মতো সম্পূরক খাবার দেয়া এবং শিশুকে কৌটার দুধ খাওয়াতে নিরুৎসাহিত করা
- শিশুকে সময়সূচি অনুযায়ী সকল টিকা প্রদান নিশ্চিত করা
- সম্পূরক ভিটামিন 'এ' প্রদান নিশ্চিত করা
- দ্রুত রোগ চিহ্নিত করা ও বাড়িতে যত্ন নেয়া এবং শিশু বেশি অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

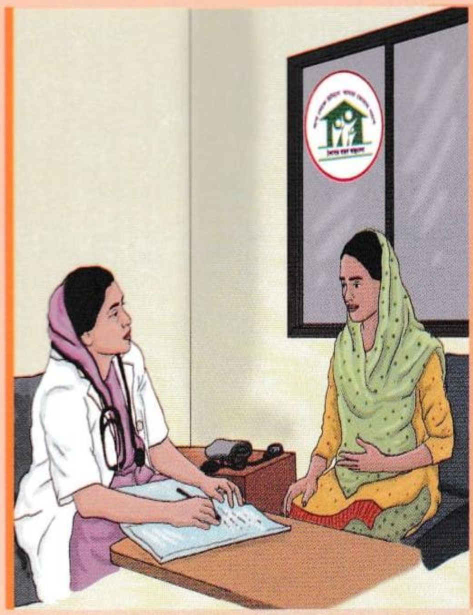

কৈশোরকালীন সময়ে শরীরে ও মনে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে এবং নতুন অনুভূতি তৈরি হয়। শারীরিক বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা এসব বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। আবার স্কুলেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় না। তাই কিশোর-কিশোরীদের জন্য কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানাতে তাদের জন্য কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা আছে। কাউন্সিলারের সাথে তারা বিভিন্ন বিষয়ে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানতে পারবে।

- কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গোপনীয়তা বজায় থাকে, তাই মন খুলে কিশোর-কিশোরী নিজের সমস্যার কথা বলতে পারবে
- কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার আছে। কিশোর-কিশোরীরা ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবে
- সকল স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে বা সাশ্রয়ী মূল্যে দেয়া হয়
- বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে

✓ কিশোর-কিশোরীরা নিয়মিত কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে এবং সুস্থ্য থাকবে।

এইচআইভি ও এইডস

এইচআইভি (HIV) হলো মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্টকারী ভাইরাস। এ ভাইরাস মানবদেহের রক্তে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এক পর্যায়ে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। এ সময় বিভিন্ন রোগ, যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলে মানবদেহ তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। ফলে যেকোনো রোগ হলে আর ভালো হয় না। শরীরের এই অবস্থার নাম এইডস।

২-১০ বছর পর্যন্ত এইচআইভি (HIV) মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। মৃত্যুই হলো এইডস-এর করুণ পরিণতি।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

এইচআইভি সংক্রমিত কারো সাথে অনিরাপদভাবে যৌনমিলন করলে

সংক্রমিত ব্যক্তির সুঁচ, সিরিঞ্জ অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে

এইচআইভি সংক্রমিত কারো রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে

শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত সংক্রমিত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করা হলে

মা থেকে সন্তানের মাঝে। সংক্রমিত মা থেকে গর্ভধারণকালে, সন্তান প্রসবকালে কিংবা মাতৃদুগ্ধ পান করা সন্তানদের মাঝে সংক্রমণ ছড়াতে পারে

এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে করণীয়

এইডস নিরাময় করার চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইচআইভি থেকে রক্ষা পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রতিরোধ করা। যেমন-

- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা
- বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর বাইরে কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক না করা এবং বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ক না করা
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা
- ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা
- রক্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই রক্তে HIV পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যে তা এইচআইভি-মুক্ত
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে অস্ত্রোপচার করা
- যৌনরোগের লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং সে অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করা।

✓এইচআইভি (এইডস) একটি সংক্রামক ব্যাধি। এর চিকিৎসা ব্যয়বহুল। সচেতনতাই পারে এই রোগ প্রতিরোধ করতে।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায় না

- হাঁচি, কাশি, কফ, থুথু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে
- একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে বা এক বিছানায় ঘুমালে
- একসাথে বা একই থালাবাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে
- একসাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়ালেখা করলে
- মশা বা কোনো পোকামাকড়ের কামড়ে
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার করলে, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে বা কোলাকুলি করলে
- একই বাথরুম ব্যবহার করলে বা একই পুকুরে গোসল করলে।

পুষ্টি

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির উপর নির্ভর করে গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা এবং গর্ভের শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা। তাই একজন গর্ভবতী মাকে প্রতিদিন শক্তিদায়ক খাবার, শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার ও রোগ প্রতিরোধক খাবার দিতে হবে।

বাড়তি খাবার খাওয়া

ফলিক অ্যাসিড ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া

শক্তিদায়ক খাবার

শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার

রোগপ্রতিরোধক খাবার

- গর্ভবতী মাকে প্রতিদিন ৪ বার খাবার দিতে হবে। প্রতিবার অতিরিক্ত খাবার হিসেবে ১ মুঠো ভাত, সঙ্গে অন্যান্য খাবার একটু বেশি পরিমাণে খেতে হবে
- মাছ, ডিম, মাংস, কলিজা, সবুজ শাক, ঘন ডাল, রঙিন সবজি ও ফল এবং তেলে ভাজা খাবার খেতে হবে
- গর্ভাবস্থায় রাতের খাবারের পর ১টি করে আয়রন বড়ি খেতে হবে।

শিশুর পুষ্টি

শিশুকে পুষ্টিকর খাবার নিয়মমতো খাওয়াতে হবে, নইলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হবে না, ঠিকমতো বেড়ে উঠবে না, শিশু কম ওজনের ও খর্বকায় হবে। শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হবে না। শিশু সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে।

০ থেকে ৬ মাস বয়সি শিশুর খাবার

- জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের বুকের দুধেই থাকে শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা
- জন্মের পর প্রথম ছয় মাস (০-৬ মাস পর্যন্ত) শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। অন্য কিছু খাওয়ানো যাবে না। জন্মের পর প্রথম ছয় মাস খাদ্য এবং পানীয় হিসেবে কেবল মায়ের দুধই শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার। মায়ের বুকের দুধে রয়েছে পর্যাপ্ত পানি, যা শিশুর পানির চাহিদা পূরণ করে
- এ সময় শিশুর অন্য কোনো খাবার বা পানীয় যেমন : মধু, চিনির শরবত দেয়া, সরিষার তেল দিয়ে শিশুর মুখের ভেতর মোছানো ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৬ থেকে ৮ মাস পূর্ণ বয়সি শিশুর খাবার

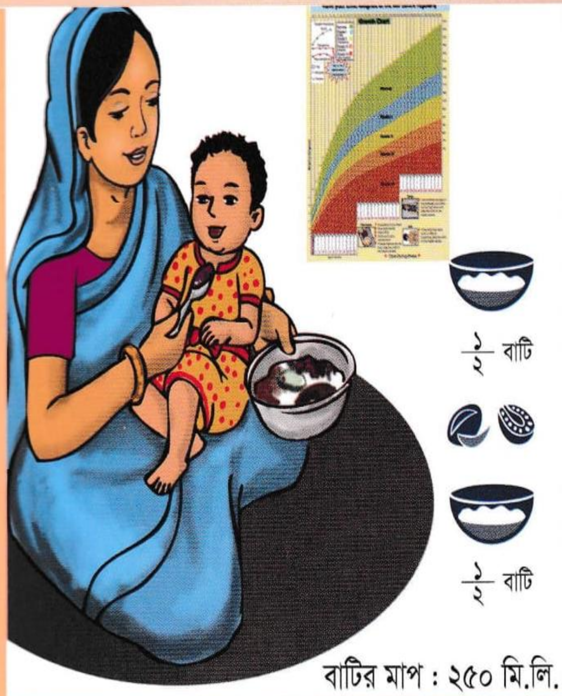

- প্রথমে মায়ের দুধ এবং পরে ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে
  প্রতিদিন অন্তত ২ বার ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার (ডাল, ভাত, শাক/সবজি সঙ্গে মাছ/মাংস/ডিম), কমপক্ষে ৪ ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে
- ২৫০ মি.লি. বাটির ১/২ বাটি করে দিনে ২ বার এবং
- ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে

- খাবার তৈরি এবং খাওয়ানোর আগে মায়ের এবং শিশুর দুই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে

৯ থেকে ১১ মাস পূর্ণ বয়সি শিশুর খাবার

বাটির মাপ : ২৫০ মি.লি.

- মাকে হাসিখুশি থাকতে হবে
- প্রতিদিন মাছ বা ডিম বা মুরগির কলিজা বা মাংস ও অন্যান্য খাবার দিতে হবে
- প্রতিদিন অন্তত ৩ বার ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার (ডাল, ভাত, শাক-সবজি সঙ্গে মাছ/মাংস/ডিম), কমপক্ষে ৪ ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে
- ২৫০ মি.লি. বাটির ১/২ বাটি করে দিনে ৩ বার
- ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা
- বাড়তি খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ দিতে হবে
- খাবার তৈরির এবং খাওয়ানোর আগে মায়ের এবং শিশুর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে
- সময় নিয়ে শিশুকে নিজে নিজে খেতে উৎসাহ দিতে হবে।

১২ থেকে ২৩ মাস পূর্ণ বয়সি শিশুর খাবার

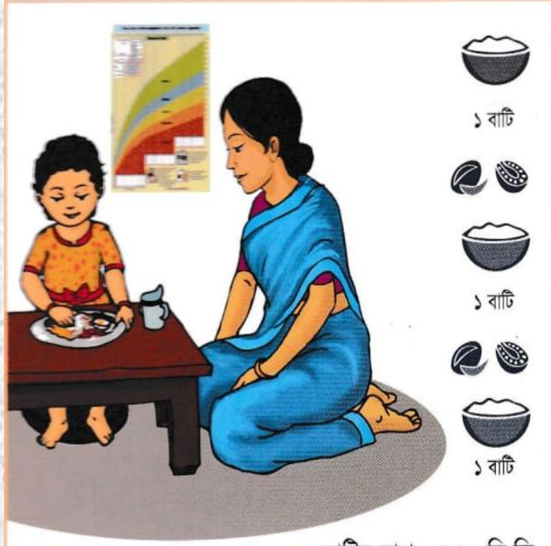

বাটির মাপ : ২৫০ মি.লি.

- শিশুকে নিজে নিজে খেতে উৎসাহ দিতে হবে
- প্রতিদিন অন্তত ৩ বার ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার (ডাল, ভাত, শাক-সবজি সঙ্গে মাছ/মাংস/ডিম) কমপক্ষে ৪ ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে
- ২৫০ মি.লি. বাটির ১/২ বাটি করে
- ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা
- বাড়তি খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ দিতে হবে
- খাবার তৈরির এবং খাওয়ানোর আগে মায়ের এবং শিশুর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

যেসব শিশুরা খেতে চায় না, তাদেরকে কীভাবে খাওয়াবেন

- শিশুর যখন ক্ষুধা লাগবে, তখন খাওয়াতে হবে
- বিভিন্ন ধরনের খাবার দিতে হবে, একই খাবার বারবার না খাইয়ে খাবারে বৈচিত্র্য আনতে হবে
- জুস, চকলেট-জাতীয় খাবার খাওয়ানো যাবে না
- উৎসাহ দিয়ে ও প্রশংসা করে শিশুকে খাওয়াতে হবে
- সময় নিয়ে ও ধৈর্য্য ধরে খাওয়াতে হবে
- শিশুকে তার পছন্দের সুষম খাবার দিতে হবে
- শিশুকে জোর করে বা মারধর করে খাওয়ানো যাবে না।

কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি

কৈশোর সময়ে শরীর বেড়ে ওঠে। এই সময়ে শরীর ও মনের সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর সুষম খাবার।

সুষম খাবার

যেসব খাবার শরীরে শক্তি জোগায়, শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে এবং রোগপ্রতিরোধ করার ক্ষমতা তৈরি করে দেয়, সেগুলোকে সুষম খাবার বলে।

শরীরের কাজসমূহের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যসমূহকে ৩টি ভাগ করা যায় :

১. শক্তিদায়ক শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য : ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, চিনি, মধু, তেল, ঘি

২. শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্য : মাছ, মাংস, ডিম, ডাল

৩. শরীরের রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষার জন্য ভিটামিন ও খনিজ জাতীয় খাদ্য : দুধ, কলিজা, ছোট মাছ, গাঢ় রঙিন শাক-সবজি, ফলমূল

কিশোর-কিশোরীদের জন্য খাদ্য

- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিনের খাবার সুষম হওয়া প্রয়োজন
- প্রতিদিন ১টি করে ডিম, সপ্তাহে একদিন ৫-৬ টুকরা কলিজা, সম্ভব হলে প্রতিদিন মাছ-মাংস খেতে হবে। কলিজা খেলে রক্তস্বল্পতা দূর হয়
- প্রতিদিন শাক-সবজি ও ফলমূল খেতে হবে
- প্রতিদিন ভাতের সাথে লেবু, কাঁচা মরিচ খাওয়া ভালো। এর থেকে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। তেল দিয়ে রান্না করা গাঢ় রঙের শাক-সবজি শরীরের ভিটামিন 'এ'-কে কাজে লাগাতে সাহায্য করে
- ১ কাপ দুধ বা দুধের তৈরি খাবার সপ্তাহে ৩-৪ দিন খেতে হবে
- কিশোরীদের সপ্তাহে ২টি করে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট ৩ মাস খেতে হবে। মাঝে ৩ মাস বন্ধ দিয়ে আবার ৩ মাস খেতে হবে। এভাবেই চলতে থাকবে। এতে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ হয়
- ৬ মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক খেতে হবে
- কিশোরীদের মাসিকের সময় আয়রন আছে এমন খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে।

কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা

সময়	তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (শর্করা জাতীয় খাবার- ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, আলু, মিষ্টি আলু)	ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য (আমিষ জাতীয় খাদ্য- মাছ, মাংস, ডিম, ডাল)	রোগপ্রতিরোধকারী খাদ্য (ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ খাবার- রঙিন শাক-সবজি, দেশি মৌসুমী ফল)
সকালের খাবার	মাঝারি আকারের ২/৩টি রুটি অথবা ২টা পরোটা অথবা ১ বাটি ভাত	১টা ডিম অথবা ১ বাটি ঘন ডাল	১ বাটি সবজি (২/৩ রকম সবজি মিশিয়ে) অথবা সবজি ভাজা (পটল ভাজি, পেঁপে ভাজি ইত্যাদি)
মধ্য-সকালের নাস্তা	বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার (চিড়া/মুড়ি+গুড়) অথবা ২/৩টি মাঝারি সাইজের বিস্কুট ও পাকা কলা	–	যেকোনো দেশি মৌসুমী ফল (আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কামরাঙা, আনারস ইত্যাদি
দুপুরের খাবার	২/৩ বাটি ভাত	১ বাটি মাঝারি ঘন ডাল ও ১ টুকরা (মাঝারি সাইজের) মাছ/মাংস/কলিজা	১ বাটি শাক (লাল শাক, কচু শাক, পুঁই শাক) অথবা সবজি
বিকালের নাস্তা	–	১ গ্লাস দুধ অথবা দুধ দিয়ে তৈরি ঘন যেকোনো খাবার (ফিরনি/সেমাই/পায়েস/পিঠা/দই ইত্যাদি) ডাল, ডিম বা বীজ দিয়ে তৈরি নাস্তা	যেকোনো দেশি মৌসুমী ফল
রাতের খাবার	২/৩ বাটি ভাত	১ বাটি ঘন ডাল (যদি সম্ভব হয় ১ টুকরা মাছ/মাংস)	১ বাটি শাক অথবা সবজি

কৈশোরে পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব

কৈশোরকাল বেড়ে ওঠার সময়। ১৮ বছর পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি চলতে থাকে। কিশোর-কিশোরীদের শরীর গঠন ও রোগমুক্ত থাকার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

- কিশোরীদের যদি পুষ্টির অভাব থাকে তাহলে পরবর্তী জীবনে, বিশেষ করে মাতৃত্বকালীন সময়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে অপুষ্টি প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে
- পুষ্টিকর খাবার খেলে কিশোর-কিশোরীদের মেধার বিকাশ ঘটে, মানসিক শক্তি বাড়ে, শরীরে শক্তি পায় বলে কাজ ও পড়ালেখায় আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে, ফলে পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়
- কিশোরীদের আয়রনযুক্ত খাবার খেতে হবে। যেমন : কচু, ডিম, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি খেতে হবে। আয়রন ট্যাবলেট ডাক্তারের পরামর্শমতো খেতে হবে
- ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খেতে হবে। ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার না খেলে হাড়ের ঘনত্ব পূর্ণ হয় না বা দুর্বল হয়। ফলে, বয়সকালে হাড়ের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়
- বেশি তৈলাক্ত, ভাজা, পোড়া খাবার খাওয়া যাবেনা। এ সময় বেশি তৈলাক্ত খাবার খেলে পরবর্তী জীবনে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিশোর-কিশোরীদের ব্যালান্সড বা ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে ৩ বার প্রধান খাবার খেতে হবে এবং ২ বার নাস্তা করতে হবে
- বাড়িতে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, বাইরের খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,
স্যানিটেশন ও
নিরাপদ পানি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

সাবান দিয়ে হাত ধোয়া : ৫টি বিশেষ সময়ে অবশ্যই সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে দুই হাত ধুতে হবে। কারণ, হাত যদি নোংরা থাকে, তাহলে সেই হাতে খাবার খেলে খাবারের সাথে রোগ-জীবাণু পেটে যাবে। এর ফলে ডায়রিয়া-সহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। তাই ৫টি বিশেষ সময়ে অবশ্যই সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে দুই হাত ধুতে হবে।

৩টি আগে
- নিজে খাওয়ার আগে
- শিশুকে খাওয়ানোর আগে
- খাবার তৈরি ও পরিবেশনের আগে

২টি পরে
- নিজে শৌচকার্য করার পরে
- শিশুকে শৌচকার্য করানোর পর

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়

মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

মাসিক মেয়েদের জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। ১২/১৩ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের মাসিক শুরু হয় এবং ৪৯ বছর বয়সে মহিলাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। তাই মাসিক কোনো অসুস্থতা নয়, বরং সুস্থতারই লক্ষণ। এটি কোনো ভয়ের ব্যাপার না। ঋতুস্রাবের বা মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য মাসিকের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্য বর্জ্যের সঙ্গে স্যানিটারি ন্যাপকিনও সতর্কতার সঙ্গে ফেলে দেয়া উচিত।

- মাসিকের সময় স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করা উত্তম। স্যানিটারি প্যাড কিনতে না পারলে পরিষ্কার সুতি নরম কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে
- স্যানিটারি প্যাড একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না। ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে
- স্যানিটারি প্যাড ৩/৫ ঘণ্টা পরপর বদলানো উচিত
- সুতি কাপড় ব্যবহার করলে, প্রতিবার ব্যবহার করার পর অবশ্যই সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করতে হবে
- মাসিক শেষ হয়ে গেলে কাপড়টি সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে প্যাকেটে করে পরিচ্ছন্ন শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাসিকে ব্যবহৃত কাপড় ২/৩ মাসের বেশি সময় ব্যবহার করা উচিত নয়।

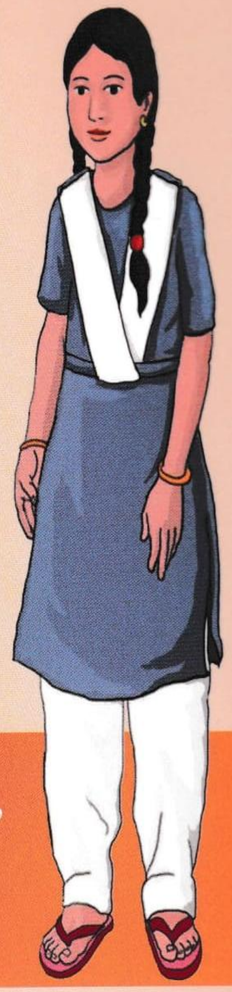

- মাসিকের সময় স্যানিট্যারি ন্যাপকিন ব্যবহার, কিশোরী ও মহিলাদের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখে।

স্যানিটেশন

শিশুর মল যেখানে সেখানে না ফেলা : শিশুর মলমূত্রে বেশি পরিমাণ জীবাণু থাকে। তাই শিশুর মল যেখানে-সেখানে ফেলা যাবে না। শিশুর মল ল্যাট্রিনে ফেলতে হবে। শিশুর মল ল্যাট্রিনে ফেলে, ল্যাট্রিনে পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে। ল্যাট্রিন অথবা 'পটি' (শিশুদের মল ত্যাগের বাটি) ব্যবহার শিশুর জন্য মলত্যাগের সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা।

শিশুকে সব ধরনের পশু-পাখি এবং মানুষের মলমূত্রের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে।

মলমূত্র

- মানুষের মল এবং পশু-পাখির মলমূত্র থেকে রোগজীবাণু ছড়ায়
- খাবার ও পানির মাধ্যমে শিশুর পেটে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে
- শিশুর পেটে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে পারে
- শিশু রোগাক্রান্ত হলে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

করণীয়

- পরিবারের সবাই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে
- ল্যাট্রিন সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে
- শিশু মলত্যাগের পর তাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- শিশুর মল ল্যাট্রিনে ফেলতে হবে
- শিশুকে শৌচকার্য করানোর পর দুই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে
- বাড়ির আঙিনায় গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির মল পড়ে থাকলে তা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে।

গৃহস্থালি আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা : এর মাধ্যমে পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার রাখা যায়। এতে অসুখবিসুখ থেকেও বাঁচা যায়।

নিরাপদ পানি ও খাবার

নিরাপদ পানি

দূষিত পানি পান করলে শিশু বিভিন্ন রকম রোগে (যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি) আক্রান্ত হতে পারে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। খাবার পানি বিভিন্নভাবে রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত হতে পারে।

যেমন :

- পানির উৎস অনিরাপদ হলে
- পানি অপরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষণ করলে
- পানির পাত্র ঢেকে না রাখলে।

পানি কীভাবে নিরাপদ রাখা যায়

- শিশুকে নলকূপ এবং বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য যেকোনো উৎস থেকে পানি পান করানোর পূর্বে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে
- পরিষ্কার পাত্রে পানি সংরক্ষণ করতে হবে
- পানির পাত্র সবসময় ঢেকে রাখতে হবে, যাতে পানিতে ময়লা-আবর্জনা না পড়ে
- শিশুকে পানি পান করানোর আগে গ্লাস এবং চামচ সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

নিরাপদ খাবার

- কাঁচা বা বাসি খাবার বিপজ্জনক হতে পারে। কাঁচা খাবার ধুয়ে বা রান্না করে খেতে হবে। রান্না করা খাবার দেরি না করে খেয়ে ফেলতে হবে
- খাবার, থালাবাসন ও খাবার তৈরির জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবজন্তুর নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে
- খাবার অবশ্যই সবসময় ঢেকে রাখতে হবে।

শিক্ষা

শিশুর বিকাশ, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা

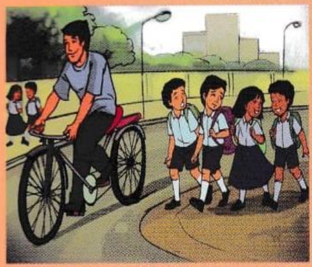

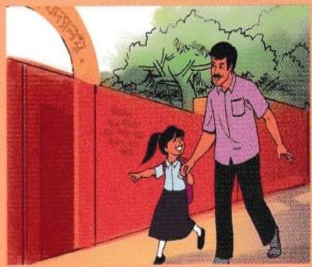

শিশুর বিকাশ

- শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলো, বিশেষ করে প্রথম তিন বছর তার মস্তিষ্ক গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশু যা দেখে, স্পর্শ করে, শোনে, যা কিছুর স্বাদ বা ঘ্রাণ নেয়, তা তার বুদ্ধি, অনুভূতি, চলাফেরা ও শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করে
- শিশুকে খেলতে ও তার চারপাশ চিনে নিতে উৎসাহ দিলে শিশু শেখে এবং তার সামাজিক, আবেগীয়, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। এটি শিশুকে স্কুলে যেতে প্রস্তুত করে তোলে
- বাবা-মা ও নিকটজন, শিক্ষক এবং পাড়াপড়শি মানুষের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া শিশুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রারম্ভিক শিক্ষা

- শিশুর বয়স **৪** থেকে **৫** বছর হলেই তাকে প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে পাঠাতে হবে।

শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে পাঠাবেন কেন

- প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে শিশুকে খেলার মাধ্যমে আনন্দ দিয়ে শেখানো হয়। ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে
- প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরি করে দেয়। ফলে প্রি-প্রাইমারি স্কুলে গেলে তারা প্রাথমিক স্কুলে যেতে আগ্রহী হয়
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে
- উপরের ক্লাসে তাদের পড়ালেখা করতে সহজ হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা

- যথাসময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো শিশুর বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- প্রত্যেক শিশুকে কমপক্ষে এসএসসি পর্যন্ত স্কুলে পাঠাতে হবে
- সব শিশুকেই তার বয়স অনুযায়ী প্রাইমারি, জুনিয়র এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। স্কুলে যাওয়ার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে
- কোনো কারণে স্কুল থেকে ঝড়ে পড়লে হলে তাকে আবার স্কুলে পাঠাতে হবে।

স্কুলে যাওয়া প্রয়োজন কেন

- শিশু স্কুলে গেলে ভালোভাবে পড়ালোখা শিখবে
- স্কুলে পড়ালেখা করলে শিশু অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে, সমাজে সম্মান পাবে
- স্কুলে নিয়মকানুনের মধ্যে বড় হলে সে শৃঙ্খলা শিখবে। একটা সুন্দর জীবন গড়তে পারবে
- স্কুলে পড়ালেখা শিখে সে সমাজে এবং দেশের একজন সুনাগরিক হতে পারবে।

শিশু সুরক্ষা

শিশু সুরক্ষা

সব শিশুরই সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। তাছাড়া তাদের বেঁচে থাকা, নিরাপদ থাকা, অভিভাবকদের সঙ্গে থাকা, তাদের মতামতের গুরুত্ব পাওয়া, প্রয়োজনীয় যত্ন পাওয়া এবং সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশুর অধিকার।

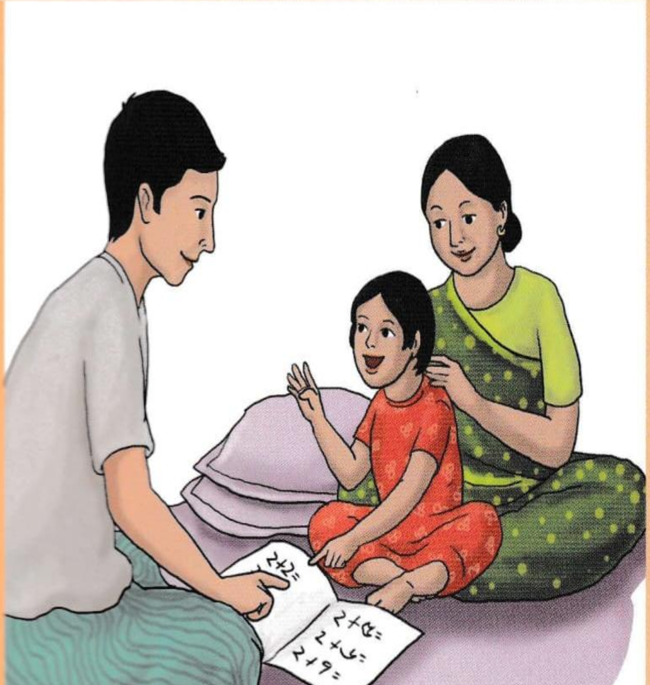

শিশু সুরক্ষায় পরিবার

- শিশু সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা পায় পরিবারে। সুরক্ষিত এবং সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব শিশুর বাবা-মা ও অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের
- শিশুর বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলার জন্য পরিবার, স্কুল ও সমাজে শিশুদের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে হবে।

শিশু সুরক্ষা

সব শিশুরই সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। তাছাড়া তাদের বেঁচে থাকা, নিরাপদ থাকা, অভিভাবকদের সঙ্গে থাকা, তাদের মতামতের গুরুত্ব পাওয়া, প্রয়োজনীয় যত্ন পাওয়া এবং সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশুর অধিকার।

শিশু সুরক্ষায় পরিবার

- শিশু সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা পায় পরিবারে। সুরক্ষিত এবং সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব শিশুর বাবা-মা ও অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের
- শিশুর বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলার জন্য পরিবার, স্কুল ও সমাজে শিশুদের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে হবে।

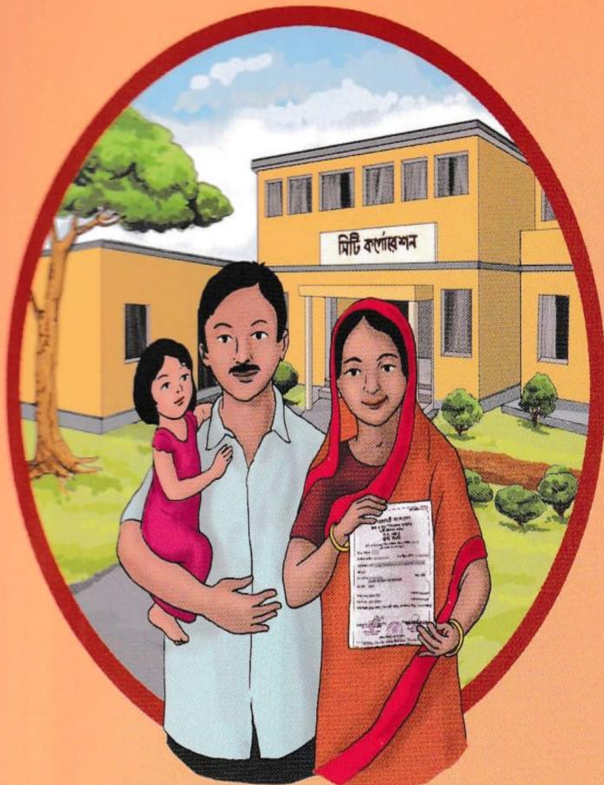

জন্ম নিবন্ধন

- প্রত্যেক শিশুর একটি নাম, সঠিক বয়স ও জাতীয়তা থাকবে। শিশুর শিক্ষা গ্রহণ, সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আইনগত ও সামাজিক সেবা নিশ্চিত করতে জন্ম নিবন্ধন সহায়ক ভূমিকা পালন করে
- জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে/ইউনিয়ন পরিষদে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করাতে হবে। জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করালে, কোনো ফি বা টাকা দিতে হবে না।
- জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন শিশুর টিকা কার্ড, পূরণকৃত জন্ম নিবন্ধন ফরম ও বাবা-মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র।

শিশুপাচার রোধ

- আমাদের দেশে অনেক শিশু দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়
- শিশুদের পাচারের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবার, পড়শি, দেশের সরকার, সুশীল সমাজসহ সকলের
- পাচার হওয়া শিশুদেরকে ফিরে পাবার পর তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবার ও সমাজে যুক্ত হবার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব নিতে হবে
- শিশুপাচার রোধে শিশু যেন অপরিচিত কারো সাথে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে একা দূরে কোথাও পাঠানো যাবে না। শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

শিশুকে যত্ন ও সুরক্ষা দিন।
জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন।
এতে কোনো ফি লাগে না। 'জন্ম নিবন্ধন' শিশুর অধিকার।

শিশু শ্রম

শিশুকাল লেখাপড়া, খেলাধুলা করার জন্য, কাজ করে আয় করার জন্য নয়। নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণ করার দায়িত্ব একটি শিশুর নয়। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম আইন অনুযায়ী ১৪ বছর বয়সের আগে একটি শিশুকে কোনো ভারী কাজ দেয়া যাবে না।

ঝুঁকিপূর্ণ সব ধরনের কাজ থেকে শিশুদেরকে দূরে রাখতে হবে। কাজ করার কারণে তাদের স্কুলে যাওয়া ব্যাহত হলে চলবে না। শিশুদেরকে অত্যন্ত খারাপ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, যেমন- দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম, যৌন ব্যাবসা, মাদক তৈরি ও পাচার কাজে কখনও যুক্ত করা যাবে না।

- শিশুকে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেয়া যাবে না

১. গাড়ির হেলপার
২. ভাঙারি টোকানো
৩. গৃহশ্রম
৪. কারখানায় ভারী কাজ ও যেখানে রাসায়নিক দূষণ আছে, যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শিশুকে দিয়ে করানো যাবে না।

শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। শিশুকাল লেখাপড়া ও খেলাধুলা করার জন্য, সংসারের ঘানি টানার জন্য নয়। তাই শিশুকে কাজে না পাঠিয়ে স্কুলে পাঠান।

শিশুকে শাস্তি

শিশুকে নিয়ম-শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য বাড়িতে বা স্কুলে শাস্তি দেয়া হয়। শিশুকে শাস্তি দিলে তার মনের উপর গভীর প্রভাব পড়ে। শারীরিকভাবে শাস্তি একটি শিশুর জন্য অনেক কষ্টকর। এর ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ হয় না। সে ভীতু প্রকৃতির হতে পারে। তাই বাড়ি বা স্কুলে শিশুকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার লক্ষ্যে কোনোভাবেই শাস্তি দেয়া যাবে না। শিশুকে আদর করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

বাল্যবিবাহ

বিয়ে একটি সামাজিক বন্ধন, যার মাধ্যমে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে একসাথে নতুন জীবন শুরু করে। সমাজের কিছু আইনকানুন এবং নিয়মনীতি মেনে বিয়ে করতে হয়। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল। তাই ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে কোনো বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাল্যবিবাহের ঝুঁকিসমূহ

- অল্প বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি থাকে। ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের ১ বছরের মধ্যে কিশোরী মেয়ে গর্ভধারণ করে ও সন্তান জন্ম দেয়। একটি মেয়ের শরীর ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের জন্য উপযুক্ত হয় না। তাই ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ একটি কিশোরী মায়ের জীবন ও তার সন্তানের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

- ছেলে ও মেয়ের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে
- শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে
- সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা কমে যায়
- দেশ গুণগত মানসম্পন্ন জনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়

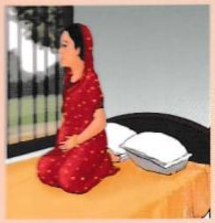

- বয়স কম থাকার কারণে একটি মেয়ে সংসারের দায়িত্ব নেয়ার উপযুক্ত হয় না। সে দায়িত্ব নিতে পারে না, ফলে শ্বশুরবাড়ি বা স্বামীর ঘরে তার উপর নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়ে যায়

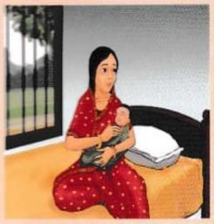

- কম বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়েই অপুষ্টিতে ভোগে
- অপরিপক্ক ও কম ওজনের শিশু জন্মের সম্ভাবনা বেড়ে যায়
- মায়ের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং প্রসবজনিত ফিস্টুলা হবার ঝুঁকি থাকে

- মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যেতে পারে

- শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

✓ **তাই বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে**

শিশু নির্যাতন

শিশুকে শারীরিকভাবে আঘাত করা, মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া, গালিগালাজ করা, অবজ্ঞা করা, যৌন হয়রানি করাই হচ্ছে শিশু নির্যাতন।
শিশুর নির্যাতন বাড়িতে, স্কুলে, সমাজে, শিশুপালন কেন্দ্রে, কর্মক্ষেত্রে- যেমন কারখানায় বা যেকোনো জায়গায় ঘটতে পারে। এর ফলে শিশুর সুস্থ বিকাশ হয় না।

শিশু নির্যাতন ৪ ধরনের :

অবজ্ঞা করা : অবজ্ঞা করা হলো যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শিশুদের পর্যাপ্ত যত্ন নেন না এবং সুরক্ষা করেন না। এসব যত্নের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আছে আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা, মনোসংযোগ এবং প্রয়োজনীয় তদারকি। এগুলোর অন্তর্গত আরো হচ্ছে পর্যাপ্ত লালনপালন বা আদর-স্নেহ, শিক্ষার সুযোগ (শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করতে পারা) ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশে এর প্রভাব : কম ওজন, ধীর গতিতে মস্তিষ্কের বিকাশ, অসুস্থতা, রোগ, দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তির ঝুঁকি।

শারীরিক নির্যাতন : শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে বয়স্ক কেউ বা বয়সে বড় বা কোনো কিশোর-কিশোরী দ্বারা শিশুর প্রতি শারীরিক কোনো হামলা/আক্রমণ। এর অন্তর্গত হচ্ছে ঘুষি মারা, সজোরে আঘাত করা, ধাক্কা মারা, লাথি মারা, চড় মারা, পুড়িয়ে দেওয়া, কালশিটে দাগ, কানে বা চুলে ধরে টানা, ছুরি মারা, শ্বাসরোধ করা বা খুব ছোট শিশুকে ধরে ঝাঁকানো ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশে এর প্রভাব : শারীরিকভাবে আহত হয়, শরীরের বাইরের কাটা বা কাটা দাগ ও কালশিটে দাগ, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পঙ্গুত্ব বা কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যু।

যৌন নির্যাতন : যৌন নির্যাতন এক ধরনের শিশু নির্যাতন, যা কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বা বড় কোনো কিশোর-কিশোরী দ্বারা যৌনতা পূরণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে- কোনো শিশুকে যৌন কাজের জন্য বলা বা জোর করা, শিশুর প্রতি অশোভন যৌনাঙ্গ প্রদর্শন, শিশুকে পর্ণ ছবি দেখানো, শিশুর সাথে যৌন স্পর্শ/নৈকট্য, শিশুকে ধর্ষণ করা বা শিশুর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা। অধিকাংশ যৌন নির্যাতনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর চেনাজানা ও তাদের আত্মীয় হয়।

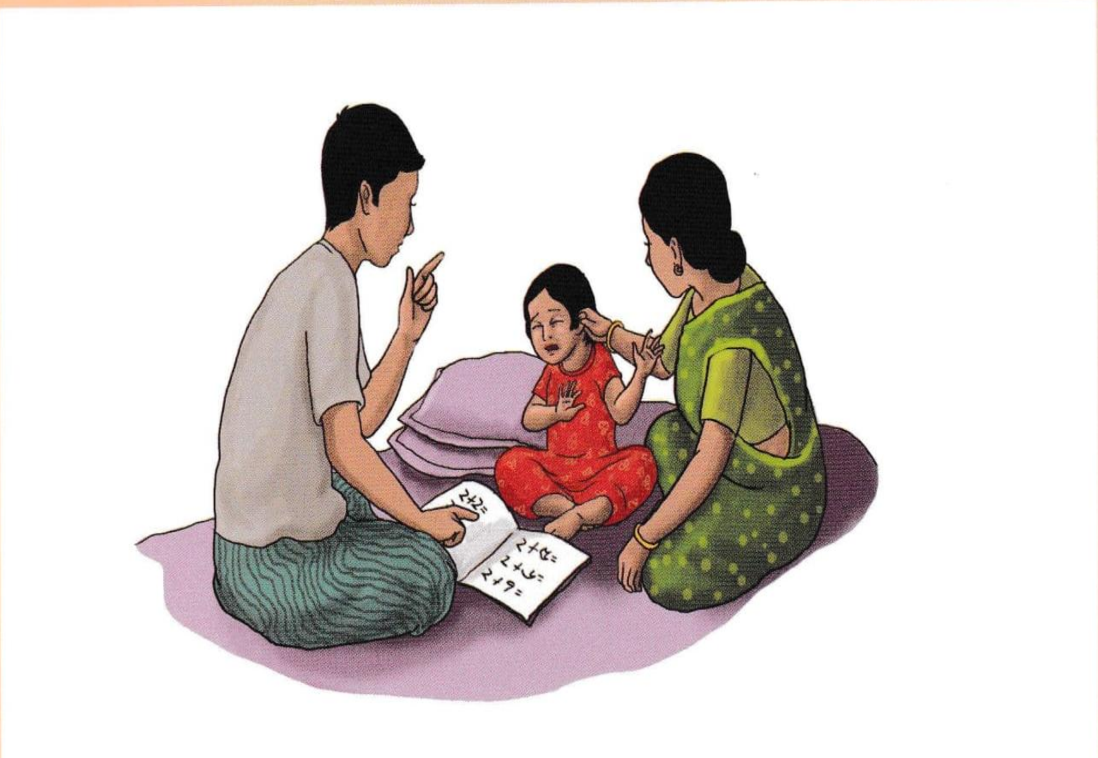

শিশুর সুস্থ বিকাশে এর প্রভাব : শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অপরাধবোধ বা নিজেকে দোষী ভাবা, দুঃস্বপ্ন, ঘুম না আসা, আত্মমর্যাদাবোধ সমস্যা, চাপ, যৌনক্ষেত্রে অপরাঙ্গমতা, আসক্তি, নিজেকে আহত করা, আত্মহত্যার চেষ্টা এবং তাতে সফল হওয়া।

আবেগীয় নির্যাতন : আবেগীয় বা মৌখিক নির্যাতনের সাথে জড়িত বিষয়গুলো হচ্ছে- অপমানকর কথা বলা, লজ্জা দেওয়া বা অতিমাত্রার সমালোচনা করা। এর মধ্যে আছে উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া, নিয়মিতভাবে কলঙ্ক দেওয়া (যেমন : তুমি খুব বোকা), অপমান করা, গালাগালি করা ইত্যাদি।

শিশুর সুস্থ বিকাশে এর প্রভাব : যদিও এই ধরনের নির্যাতন শরীরে ক্ষতচিহ্ন ফেলে না, এগুলো শিশুর আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তাবোধ ও অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরির ক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করে।

শিশুর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ

- বিভিন্ন স্থানে এমনকি বাড়িতেও যেকোনো শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের আশংকা থাকে। সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মেয়ে এবং ছেলে শিশুদেরকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবার, পাড়া-মহল্লার মানুষ ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ও জনপ্রতিনিধিদের

- মেয়ে ও ছেলেদের জন্য তাদের বাড়ি, স্কুল, কর্মক্ষেত্র ও পাড়া- মহল্লায় যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হওয়ার আশংকা থাকতে পারে। যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি থেকে শিশুদেরকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে

- যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার শিশুরা আর যাতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে না, পড়ে দ্রুত সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সঠিকভাবে শিশু লালনপালনের জন্য পরামর্শ

আদর ও ভালোবাসা প্রকাশ করুন

- একটুখানি উৎসাহ, প্রশংসা, স্বীকৃতি বা কেবল এক টুকরো হাসি আপনার শিশুদের আত্মবিশ্বাস এবং চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে
- তাদেরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসুন। আপনার আদর পাওয়ার জন্য তাদেরকে যে রকম হতে হবে বলে, মনে করেন আপনি সে রকম হতে বাধ্য করবেন না। ওদেরকে জানতে দিন যে, আপনি সবসময় ওদেরকে আদর করবেন- যা কিছুই হোক না কেন
- শিশুকে জড়িয়ে ধরুন। এতে সে নিরাপদ বোধ করবে
- ভালো আচরণ করুন, তাতে তারা এই জেনে খুশি হয় যে মা-বাবা তাদের ভালোবাসে।

শিশুদের কথা শুনুন

- শিশুদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করুন এবং তাদের বয়সী যেমনই হোক না কেন 'কী বলতে চায়' মন দিয়ে শুনুন
- এমন একটি আবহ তৈরি করুন যেখানে তারা বড় বা ছোট- যেকোনো সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারে।

তাদের নিরাপদ ভাবতে সাহায্য করুন

- বাড়িতে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করুন। শিশুদের সামনে স্বামী/স্ত্রী তর্কাতর্কি বা ঝগড়া/মারামারি করবেন না। তাদের দেখান যে, মানুষ যখন দ্বিমত পোষণ করে, তারা শান্তি পূর্ণভাবে মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

শিশুর আচরণবিধি ঠিক করুন

- কতটুকু করা যাবে, কতটুকু করা যাবে না- এ বিষয়গুলো তাদের শেখান। কীভাবে তারা বড়দের সম্মান করবে, সমবয়সিদের সাথে মিশবে, কীভাবে খাবে, তাদের আচরণ যাতে সুন্দর হয় তা শেখাবেন
- আঘাত করে তাদেরকে বাধ্য করবেন না। এতে কেবল অসন্তুষ্টি/বিরক্তির জন্ম নেবে আর তা তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবে
- কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ- তা তাদের শেখান।

শিশুদের প্রশংসা করুন

- অন্যদের সাথে আপনার শিশুদের তুলনা করবেন না, বিশেষ করে ভাইবোনদেরও সঙ্গে। প্রত্যেক শিশুই আলাদা আর ব্যতিক্রম।

আচরণ দেখিয়ে সমালোচনা করা এড়িয়ে চলুন

- যখন আপনার শিশু আপনাকে অমান্য করে বা ভুল কিছু করে, কখনো বলবেন না, "তুমি খারাপ ছেলে/মেয়ে"। তার বদলে তাকে বলুন যে, তার আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সাথে বিকল্প কিছুর পরামর্শ দিন
- সবার সামনে অপমান করবেন না। তারা যদি সবার সামনে খারাপ আচরণ করে, তাদেরকে একপাশে নিয়ে যান এবং আলাদাভাবে বুঝিয়ে বলুন।

আদর্শ ভূমিকা পালন করুন

- মা-বাবা শিশুদের কাছে আদর্শ মানুষ। তাই তাদের আশেপাশে আপনি কী বলেন আর কী করেন সে দিকে মনোযোগ দিন এবং ভেবে দেখুন কী ধরনের উদাহরণ আপনি তৈরি করছেন
- আপনি কি চান আপনার শিশুরা আপনার কথা শুনুক? তাদেরকে দেখান যে, আপনি তাদের কথা শোনেন
- আপনি যদি চান যে আপনার পুত্র বা কন্যা ভাগ করে নিতে শিখবে, তাহলে আপনি উদাহরণ বানান আর আপনার কিছু তাদের সাথে ভাগাভাগি করুন।

শিশুর সাথে সময় কাটান

- পরিবারের সবাই মিলে বাইরে যান আর শিশুদের আগ্রহ কীসে ভেবে দেখুন
- যখন তারা বাড়ির কাজ করে, তাদের পাশে বসুন আর তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলুন।

পুরো হৃদয় দিয়ে তাদের ভালোবাসুন, কিন্তু তাদের দমন করবেন না

শিশুদের জখম হওয়া থেকে রক্ষা করা

- অনেক শিশুই বিভিন্নভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আঘাত পাওয়ার কারণে শিশুদের অনেকেই স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধী হয়, কখনো-বা তাদের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- সব বয়সেই বিভিন্নভাবে আঘাতের কারণে জখম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের আহত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই জখমের কারণে বেশি মৃত্যুবরণ করে।

জখম হওয়ার কারণসমূহ

- সড়ক দুর্ঘটনা, আগুন পুড়ে যাওয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, পড়ে যাওয়া, বিষক্রিয়া।

জখম হওয়া শিশুদের রক্ষায় করণীয়

- মা-বাবা পরিচর্যাকারীদেরকে শিশুদের প্রতি নজর রাখতে হবে
- রাস্তাঘাটে শিশুদেরকে খেলতে দেয়া যাবে না। রাস্তা পারাপারের সময় বড়দের সাথে থাকতে হবে
- শিশুদের আগুন, রান্নার জ্বলন্ত চুলা, গরম পানি বা অন্য গরম তরল পদার্থ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে। তাহলে শিশুদের আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদে রাখা যাবে
- ঘরের সিঁড়ি, ছাদ, বারান্দা, জানালা, খেলাধুলা ও ঘুমানোর জায়গা সুরক্ষিত হতে হবে। তাহলে পড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদে রাখা যাবে
- ওষুধ, বিষ, ব্লিচিং পাউডার, অ্যাসিড শিশুদের দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে রাখতে হবে
- ছুরি, কাঁচি, ভাঙা কাঁচ বা চোখা জিনিস শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে
- ধাতব মুদ্রা, বোতাম প্রভৃতি শিশুরা মুখে ঢোকাতে পছন্দ করে। এগুলো গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে শিশু মারা যেতে পারে। তাই এগুলো শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

এই বইটিতে অন্তর্ভূক্ত তথ্যসমূহ বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, ফ্লিপচার্ট ও ব্রুশিওর থেকে সংকলিত।

সূত্র

১. সোনালি আলো (ফ্ল্যাশ কার্ড), আইএমসিআই কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ

২. শিশুর খাবার ও পুষ্টি (ব্রুশিওর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩. কৈশোরে পুষ্টি (ফ্লিপচার্ট), ইউনিসেফ

৪. এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক ফ্ল্যাশ কার্ড, জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ

৫. জীবনতথ্য, বাংলাদেশ সংস্করণ ২০১০, ইউনিসেফ

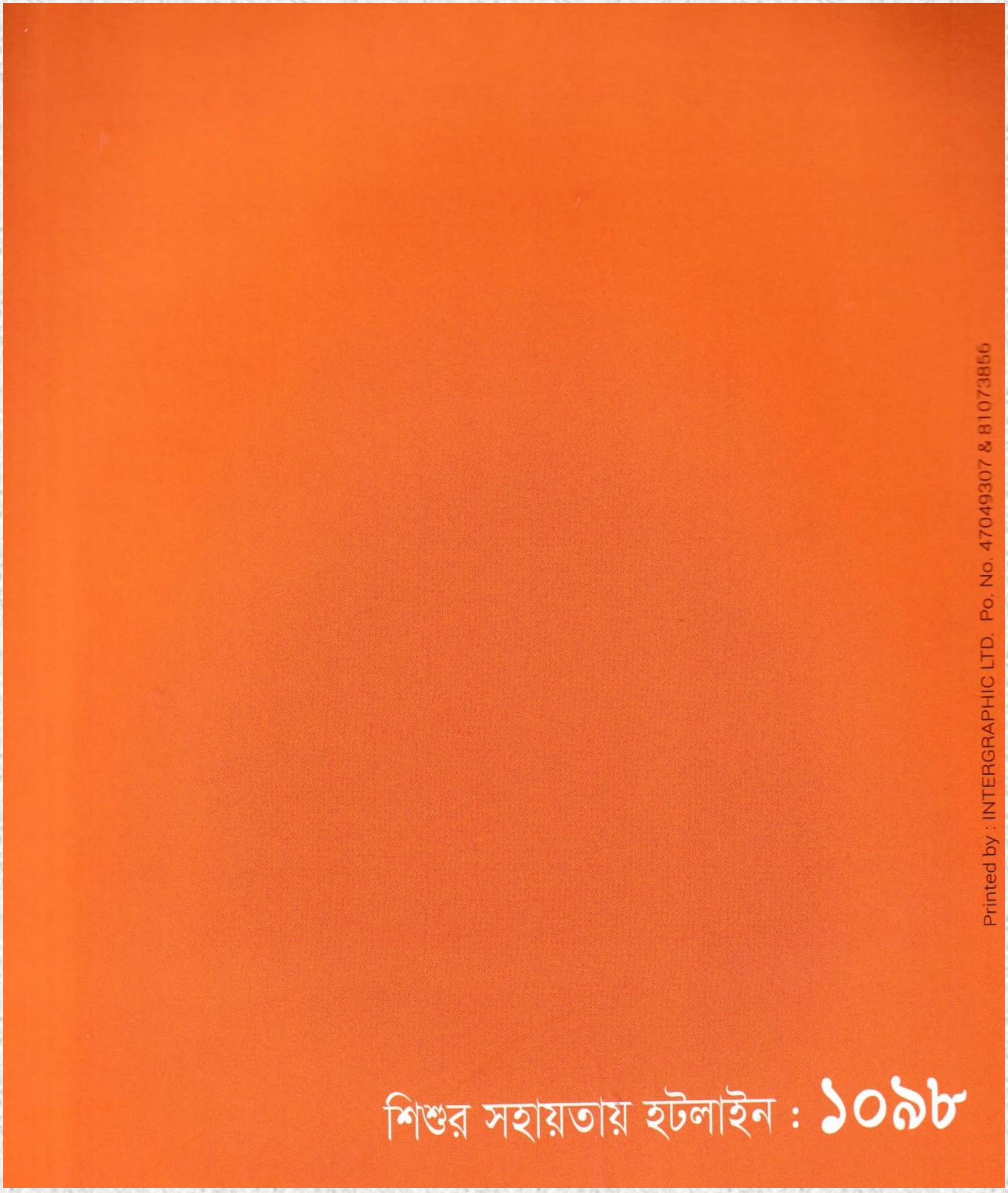
Printed by : INTERGRAPHIC LTD. Po. No. 47049307 & 81073856

শিশুর সহায়তায় হটলাইন : ১০৯৮

[সংগ্রহ ও নির্মাণে : আনিছুর রহমান, জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, সুনামগঞ্জ]